স্বচ্ছতোয়ার ঠিকানা

অনিরুদ্ধ রাহা

পুনশ্চ

হিমশীতল বাতাসের স্তর ভেদ করে দুরন্ত গতিতে পড়ে যাচ্ছি আমি। দুকানের পর্দায় তীব্র শীতল শানিত বাতাস। বাতাসের শব্দে কান পাতা দায়। পড়ে যাচ্ছি। দূর থেকে আরও দূরে সরে সরে যাচ্ছে উজ্জ্বল নীল আকাশ। আমি তাকিয়ে আছি আকাশের দিকে। নীচে, আরও নীচে নেমে আসছি আমি। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাই। ধূসর সবুজ আভা। দেখা যায় না কিচ্ছু। শ্বাস রোধ করে বাতাসের ক্ষিপ্র আলিঙ্গন। কিছুই দেখা যায় না নীচে। তবে কি ওইখানেই আছে পাথরের সেই চাতালটা? প্রাণহীন পাথরের কঠিন চাতাল? ঠিক যেখানে আছড়ে পড়েছিল অপর্ণা? থেঁতলে গিয়েছিল মাথাটা। তবু তখনও চোখদুটো তাকিয়েছিল অনেক দূরের আকাশটার দিকে। রক্ত, রক্ত, কত যে রক্ত চারিদিকে! শীতল হাওয়ার স্রোত শিরদাঁড়ায়। চমকে উঠি। চোখ মেলতেই অন্ধকার ঘর। ঘামে ভিজে গেছে সারা শরীর। গলা শুকিয়ে কাঠ। ধড়মড় করে উঠে বসি। এই তো, আমি তো আমারই ঘরে। আশ্চর্য স্বস্তি। তবু ঘামছি তখনও। পড়ে যাবার স্বপ্নটা দেখতাম ছোটোবেলা থেকেই। ঘুম ভেঙে যেত ভয়ে। অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে খুঁজতাম মাকে। মাথায় হাত বুলিয়ে বুকে টেনে নিত মা। মায়ের গায়ের গন্ধে পরম নির্ভরতায় ঘুমিয়ে পড়তাম আবার। কোনও কোনও দিন হাত বাড়িয়ে খুঁজে পাইনি মাকে। ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠেছি 'মা...'। পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেছে মা। বাবাও এসেছে পাশের ঘর থেকে। সন্তু তো তখনও জন্মায়নি।

ভয় পেতাম তখনও। ভয় পাই এখনও। কিন্তু অনুভূতিটা পালটে গেছে। মাকে ডাকি না এখন। ঘুম ভেঙে আশ্চর্য স্বস্তি। ঘামে ভিজে যায় রাত্রিবাস। শরীর জুড়ে অজানা অনুভূতি। তখনও ঘামছি। শরীরে লেপটে আছে রাতের পোশাক। না পালটে উপায় নেই। বিছানা থেকে উঠে আলো জ্বালি। টয়লেট-এও যাওয়া প্রয়োজন। ঘর থেকে বেরিয়ে আলো আঁধারে ভরা বারান্দার ধারে ঘেরা টয়লেট থেকে কাজ সেরে ঘরে আসি। আলনায় পাট করে রাখা নাইটিটা নিতে নিতে চোখ চলে যায় দক্ষিণের খোলা জানলাটার দিকে। পর্দাটা টানা নেই। আলোটা নিভিয়ে জানলার কাছে গিয়ে

তাকাই গলির ওপারে গজু ঘোষালের বাড়ির চিলেকোঠার ঘরের দিকে। অন্ধকার। মাঝে মাঝে গভীর রাতেও আলো জ্বলতে দেখেছি। চাকরির পরীক্ষা। কত রাত, কত দিন, কতটা যৌবন পার হলে যে সরকারি চাকরির পরীক্ষার সঠিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয় সে কথা অজানাই রয়ে গেল।

কর্পোরেশনের ল্যাম্পপোস্ট-এর যেটুকু আলো আমার জানলায় এসে পড়েছে তা যেন অপরিচিত করে তুলেছে ঘরের ভিতরের চেনা দৃশ্যটুকু। গাঢ় অন্ধকারের চাইতে আবছায়াতেই তো নিহিত থাকে গভীরতর রহস্যময়তা। পর্দাটা টানার প্রয়োজন ছিল না। তবু টেনে দিই পর্দাটা। ঘামে ভেজা রাত্রিবাস পরিবর্তন করে আবার আসি জানলার কাছে। পর্দাটা সরাতেই আবারও ঘুমন্ত পাড়া। আমার এই জানলাটা দিয়ে এখনও দেখা যায় এক টুকরো আকাশ। দূরে কোথাও বোধহয় বৃষ্টি হচ্ছে। কালো আকাশের গায়ে সরু একফালি বিদ্যুতের ঝলক। চিরে দিয়ে যায় আমার ছোট্ট আকাশকে। আকাশ ঢাকা বাড়িগুলোর ফাঁক ফোঁকর দিয়ে কি করে যেন ঢুকে পড়ে একটু ভেজা বাতাস। ভালো লাগে। ভালো লাগতে থাকে। ঠিক তখনই দম আটকানো কাশির আওয়াজ। পাশের বাড়ির সনাতন পালের টান উঠেছে আবার। রাত ভোর কাশতে থাকবে এখন। ছোটোবেলায় এই সনাতন পালকে দেখেছি। সৌখীন মানুষ। সাদা জামা সাদা প্যান্ট পরে অফিস যেতেন। মাথায় বড়ো বড়ো চুল। অফিসে রিক্রিয়েশন ক্লাবে নাটক করতেন তখন। রিহার্সাল সেরে ফিরতে রাত হত। অনেক ছোটো তখন, তবুও কানাকানি শুনেছি পাড়ায়। নাটক, থিয়েটারের দৌলতে সনাতন পালের নাকি ভালোই বাজার ছিল মহিলা মহলে। বিয়ে করেছিলেন অনেক দেরিতে। বাবা ঠাট্টা করে মা কে বলেছিল, 'যাক, এতদিনে দাঁড়ে বসল সনাতন।' দাঁড় অবশ্য ভালো করেই বেঁধেছিল সনাতন পালকে। কিছুদিনের মধ্যেই পাড়ার মহিলামহলে ফিসফাস গুঞ্জন, 'কী লজ্জা, কী লজ্জা! দিনে দুপুরে... জানলা বন্ধ করতেও খেয়াল থাকে না গো!' মায়েদের কথা ঠিক বুঝতে পারতাম না। কিন্তু গা ঠেলাঠেলি আর হাসির হুল্লোড়ে বুঝতে পারতাম নিষিদ্ধ একটা কিছু ঘটেছে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ছেলে হল সনাতন পাল-এর। ছেলের অন্নপ্রাশনে আইসক্রিম খাইয়েছিল ওরা। তখনও এ পাড়ায় নিমন্ত্রণবাড়িতে শেষপাতে আইসক্রিম-এর চল ছিল না। এ পর্যন্ত একরকম। তারপর সবকিছুই বেশ তাড়াতাড়ি ঘটতে লাগল সনাতন পাল-এর জীবনে। ছেলের পর এক মেয়ে তারপর আবার ছেলে। দিনদিন রোগা হচ্ছিল সনাতন গিন্নি। তারপর একদিন হঠাৎ বাড়ির সামনে অ্যাম্বুলেন্স। আমাদের ছোটো গলিতে সে গাড়ি ঢোকাই দুষ্কর। আর বাড়ি ফেরেনি পাল গিন্নি। ছোটো ছেলেটার বয়স তখন সবে তিন। ভুগতে শুরু করল নানান অসুখে। বছর দেড়েকের মধ্যেই চলে গেল সেও। খুব তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যাচ্ছিল সনাতন পাল। মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য

ব্যস্ত হয়েছিল খুব। দিয়েও ছিল ষোলো বছর পার হতে না হতেই। সে বিয়েতে অবশ্য নিমন্ত্রিত ছিল জনা পঞ্চাশ প্রতিবেশী। আইসক্রিম ছিল না শেষপাতে। সে বছরেই রিটায়ার করল সনাতন পাল। ছেলেটা কিছুই করে না তখনও। হাঁপানিও ধরেছে ততদিনে। বছর চারেক পর সন্তু একদিন খবর দিল সনাতন পালের ছেলে বিয়ে করে বউ এনেছে। 'সে কী রে? কিছুই তো করে না...।' মায়ের বিস্ময়ে সন্তু জানায়, ইলেকট্রিক-এর সরঞ্জামের যে দোকানে কাজ করে বুড়ো, তার মালিকের একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করেছে। 'তবে তো তৈরি ছেলে....!' মায়ের কথার সার্থকতা প্রমাণ করতে মাস তিনেকের মধ্যেই বাড়ি ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল বুড়ো। সনাতনের হাঁপানির কাশির শব্দে নাকি দাম্পত্য জীবনের নিত্যকর্মে বাধা পড়ে বুড়োর বউ-এর। পাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসে সনাতন পাল-এর কাশির আওয়াজ। হারিয়ে যেতে থাকে আমার একটুকরো আকাশের দিকে তাকিয়ে টুকরো ভালোলাগাটুকু। ভয় করতে থাকে। পাথরে আছড়ে পড়ার দৃশ্যটা ফিরে আসে আবার।

'জেতার ইচ্ছাটাই জয়ের মূল কথা। ইচ্ছাটাকে বাঁচিয়ে রাখলে জয় হবেই। আজ না হোক কাল। ভয় পেলে এই ইচ্ছাটাই মরে যায়। তখন আর সম্ভাবনাই থাকে না জয়লাভের। ভয়কে জয় করতে হবে। সুচিন্তিত পদক্ষেপই জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে। সাঁতার না জেনে জলে নামতে নেই। সেটা জলকে ভয় পাওয়া নয়। নিজের অজ্ঞানতা অনুধাবন করে বিপদ এড়িয়ে যাওয়া। তারপর যোগ্য শিক্ষকের কাছে সাঁতার শিখে নিলেই জলকে ভয় পাবার কোনও কারণ আর থাকবে না...।' সন্তুকে পড়াতে এসে এমন কত কথাই বলতো আনন্দদা। পাশের ঘর থেকে শুনতে শুনতে মনে হতো, আমিও তো এইকথাগুলোই ভাবি। বলতে পারি না এমন করে। অবাক হয়ে শুনতাম আনন্দদার কথা। অপেক্ষায় থাকতাম সপ্তাহে ওই তিনটে দিনের। দীর্ঘ ঋজু শরীর, সুন্দর কণ্ঠস্বর, একমুখ দাড়ি, অবিন্যস্ত চুল। আনন্দদাই তো আমার কাছ থেকে দেখা প্রথম অনাত্মীয় পুরুষ। পদ্মপুকুরের দিকে থাকত তখন ওরা। ব্যাংকে চাকরি করত। কলেজে পড়ানোর শখ ছিল। রেজাল্টও খুব ভালো। তবু হয়নি কলেজে পড়ানো। ছাত্র থাকাকালীন অতিবাম ছাত্র সংগঠনের নেতা ছিল আনন্দদা। অগত্যা, দুধের স্বাদ ঘোলে। প্রাইভেট টিউশন করে ছাত্র পড়ানোর আনন্দ আস্বাদন। আমি অপেক্ষায় থাকতাম কখন আমাদের গলির মোড়ে উঁকি দেয় দীর্ঘ ঋজুদেহী ছেলেটি। দিনান্তের পর আমার ছোট্ট ঘরের নিভৃত অবকাশে হয়তো উঁকি দিয়ে যেত সুদূর এক সম্ভাবনা। আনন্দদাও কি সপ্তাহের এই দিনকটার প্রতীক্ষায় থাকে? ডালহৌসি পাড়ায় অফিস সেরে দুবার বাস পালটে আমাদের বাড়ি। ঘণ্টা দুয়েক সন্তুকে পড়িয়ে আবার দুবার বাস পালটে ভবানীপুর। আনন্দদা তো অর্থের জন্য পড়াত না।

মাস্টারমশাইকে আকর্ষণ করার মতো অসাধারণ মেধাও তো ছিল না সম্ভবত। আমি তখন সদ্য বিএ পাশ। চাকরির পরীক্ষা দেবার স্বপ্ন চোখে।

'আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে সবচাইতে বড়ো ক্ষতি কি জানেন?'

মাথা নীচু করে থাকি। আমার পাস কোর্সে বিএ পাশ করা জ্ঞানের পরিধির মধ্যে তৃতীয় বিশ্ব শব্দটুকুই নতুন সংযোজন। তাই মাথা নীচু হয়েই থাকে। আনন্দদা অবশ্য ওসব খেয়াল করে না। বলতে থাকে, 'শুধুমাত্র একটু নিরাপত্তার জন্য, দুবেলার দুটো স্কোয়ার মিল আর মাথা গোঁজার ঠাঁই জোগাড় করার জন্য চাকরির খোঁজে নষ্ট হয়ে যায়, ব্যর্থ হয়ে যায় কত প্রতিভা। তাতেও সবাইকে চাকরি দেবার সামর্থ্য নেই আমাদের। যারা পেল, তারা হারিয়ে গেল ১০টা ৫টার চেনা আবর্তে আর যারা পেল না তারা দিনাতিপাত করতে থাকল একরাশ অভাব আর অভিযোগ নিয়ে। সম্ভাবনাময় ফুটবলার হয়ে গেল সেলসম্যান, গায়ক বা লেখকের হয়তো ঠাঁই হল সরকারি অফিসের ফাইলের আড়ালে অন্ধকার এক কোণে.... নিজেকেও জানা হল না, দেশও কিছুই পেল না। তৃতীয় বিশ্বে মানবসম্পদের এই ধ্বংস ডলারে কনভার্ট করলে কত সহস্র বিলিয়ন যে হত তার হিসাবও রাখল না কেউ....।'

অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। আনন্দ দা বলে, 'আপনি চাকরি খুঁজছেন। হয়তো পেয়েও যাবেন। কিন্তু আপনার ভিতরের সে সব সম্ভাবনাগুলোকে মেরে ফেলে আপনি অফিসের পথে রওনা দেবেন তার হিসাব করবে কে? আপনি যে তৃতীয় বিশ্বের নাগরিক....'

সেই তো ছিল আমার প্রথম বিশ্ব দর্শন। আমার ভিতরের কোনও সম্ভাবনার কথা তো আমার জানাই হয়নি কখনও। সত্যি বলতে কী, নিজেকে নিয়ে এমন কোনও বিশ্বাসও তৈরি হয়নি কোনোদিন। এভাবে ভাবার কথা বলেওনি কেউ আগে। আনন্দদার কথায় বিশ্বাস কতটা উৎপন্ন হয়েছিল জানি না, কিন্তু ভালোলাগাটা বেড়ে গিয়েছিল অনেক অনেক গুণ। আর তৃতীয় বিশ্বের অবশ্যম্ভাবী বাস্তবকে মেনে নিয়ে, আমার ভিতরের সম্ভাবনাকে জাগ্রত করার প্রচেষ্টা ছেড়ে, চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতিতে আমাকে সাহায্য করায় ব্রতী হয় আনন্দদা। আমার ভালোলাগার স্রোত তখন নিরবচ্ছিন্ন। মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকি। অবাক বিস্ময়ে শুনতে থাকি সাধারণ জ্ঞানের অসাধারণ সব তথ্য। লজিকাল রিজিনিং এর গুঢ় তত্ত্ব ছেড়ে আমার মন তখন যুক্তিহীন নিরুদ্দেশের পথে। চাকরি পাবার প্রতিজ্ঞাকে ছাপিয়ে তখন মন জুড়ে শুধুই প্রস্তুতির আবেগ।

॥ দুই ॥

মাঝে মাঝে আমার বুকের মধ্যে একটা নদী বইতে থাকে। খরস্রোতা নয়। কিন্তু তার তিরতিরে স্রোতে আশ্চর্য এক শিরশিরানি। অনেক ছোটোবেলায় একবার পুজোর ছুটিতে মায়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম মণি দিম্মার বাড়ি। সেই প্রথমবার। সন্তু হয়নি তখনও। ও তো আমার থেকে আট বছরের ছোটো। আলিপুরদুয়ার রেল স্টেশনে নেমে বাসে করে আরও প্রায় চল্লিশ মিনিট। গ্রামের নাম বাছুরডোবা। সেই ছোটোবেলাতেও পছন্দ হয়নি নামটা। কিন্তু বাস থেকে নামতেই অভ্যর্থনা জানাল সীমাহীন সবুজের সমারোহ। এত সবুজ আগে দেখিনি কখনো। বাস থেকে নামতে না নামতেই প্রাণপণে সাইকেল চালিয়ে এসে উপস্থিত বেশ রোগা এক ভদ্রলোক।

'কেমন আছ পান্নাদা?', প্রণাম করে মা।

'তুদের খবর বল.... পথে কইষ্ট হয় নাই তো.... একা আইসতেসিস.... মা খুব চিন্তা কইরতেসিল।'

'না, না.... কোনও সমস্যা হয়নি।'

'আরে! আমার ভাগ্নীর দিকে তো তাকাই নাই এখনও.... আহা মুখখান শোকাইয়া গেসে গিয়া.... খুব খিদা পাইসে, তাই না রে?'

আমাকে কোলে তুলে সাইকেল-এর সামনের রডে বসিয়ে দেয় পান্নামামা। মাকে বসতে বলে কেরিয়ারে। আমাদের দুজনকে নিয়ে অবলীলায় সাইকেল চালিয়ে মাঠ পেরিয়ে গ্রামের ভিতর পৌঁছে গেল মামা। সামনের দুটো ঘরে পাকা দেওয়াল খড়ের চাল। উঠোন পেরিয়ে ভিতরে আরও তিনটে কাঁচা ঘর আর রান্নাঘর। একপাশে ছাঁচের বেড়া ঘেরা শৌচালয়। এমন বাড়িতে থাকিনি কখনও। মণিদিম্মা মায়ের মাসি। মায়ের বাবা মা মারা গেছেন অনেকদিন। একমাত্র দাদা, আমার নিজের মামা নিরুদ্দেশ। তার কথা বলতে বলতে চোখের জল ফেলত মা। সেই ছোটোবেলায় বুঝতে পারতাম তার নিরুদ্দেশ হওয়ার পিছনে আছে এমন কোনও কারণ যা ভাইকে হারানোর দুঃখ ছাপিয়েও একটু যেন গর্বিত করে মাকে। বাপের বাড়ির লোক বলতে ওই মণিমাসি, পান্নাদা আর ঝুমাবউদি। ফোকলা হেসে আমাকে জড়িয়ে ধরে হঠাৎ সে কি কান্না মণিদিম্মার।

'আমার কপাল.... এত্তো বড়ো হয়্যা গেইলি তুই.... তুর থাতু কইলকাতায় গিয়া তুরে একবার দেইখবার পাইরল না....'

বুড়ির ভাষা বুঝতে যেটুকু কষ্ট, তা সহজ হয়ে গিয়েছিল স্নেহের পরশে। ভালোবাসার ভাষাই এমন। সে ভাষা বোঝার শুরু সেই সেবারের বাছুরডোবায়।

'নদী দেখতে যাবি?'

'নদী? নদী কী মা?'